স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ইসলাম

প্রফেসর ডা. কর্নেল জেহাদ খান (অব.)

Academia Publishing House Ltd

Academia Publishing House Ltd

স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ইসলাম

প্রফেসর ডা. কর্নেল জেহাদ খান (অব.)

গ্রন্থস্বত্ব ©
প্রফেসর ডা. কর্নেল জেহাদ খান (অব.)

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

মূল্য
টাকা ২৫০.০০

ISBN
978-984-35-5991-3

প্রচ্ছদ
এম এম হোসেন

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা- ১২০৫
মোবাইল: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩ ৯৫৪, ০১৪০০ ৪০৩ ৯৫৮
E-mail: aplbooks2017@gmail.com

পরিবেশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (তৃতীয় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
মোবাইল: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩ ৯৪৯

সূচি

মুখবন্ধ	০৭
লেখকের কথা	১১
মানবসৃষ্টির সূচনা	১৭
মানুষের সৃষ্টি জমাটবাঁধা রক্ত থেকে	২১
আমাদের রক্তনালির আজব কথা	২৫
হৃৎপিণ্ড পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত পাম্পমেশিন	৩১
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন	৩৭
বিয়ে জান্নাত থেকে পাওয়া একটি উপহার	৭১
হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধের কার্যকর উপায়	৭৭
রোজা হৃদ্‌রোগের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ	৮১
ধর্ম ও বিজ্ঞানের আলোকে মাদকাসক্তি এবং তার প্রতিকার	৮৩
আত্মহত্যার অপর নাম ধূমপান	৯৫
পান-সুপারি সবচেয়ে কম আলোচিত বিষাক্ত জিনিস	৯৯
সংক্রামক ও অন্যান্য রোগে কালোজিরা, আজওয়া খেজুর ও রক্তমোক্ষণ	১০৩
মহামারিতে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশনা এবং আমাদের করণীয়	১০৭
যুদ্ধ, শরণার্থী, সংখ্যালঘু নির্যাতন – জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি	১১১
উপসংহার	১১৭

উৎসর্গ

এই বইটি আমার মরহুম বাবা-মা এবং মরহুমা বোন বিলকিস খানমকে উৎসর্গ করলাম। এই বই পড়ে কেউ যদি উপকৃত হন, তাহলে তার সওয়াবটুকু যেন মহান আল্লাহ তাদের আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত করে দেন।

মুখবন্ধ

বিশিষ্ট চিকিৎসক কর্নেল (অব.) জেহাদ খানের লেখা 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ইসলাম' শীর্ষক বইটি আমি পড়েছি। এটি সহজ ভাষায় লিখিত এবং সুখপাঠ্য। ইসলামকে অভিহিত করা হয় 'A complete code of life' বা একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে। তাই যদি হয়, তবে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে ইসলামের যে সুনির্দিষ্ট কিছু পথনির্দেশনা থাকবে, সেটাই সকলে আশা করে। আসলেই পথ নির্দেশনা আছে। কুরআনে আছে, হাদিসেও আছে। বইটিতে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক তার ভূমিকায় মানবদেহের কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃজনশৈলী আলোচনা করতে গিয়ে আক্ষেপ করেছেন এই বলে যে, এগুলো এত সুশৃঙ্খল, এত নিপুণভাবে আল্লাহ উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টি করেছেন, অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এগুলো চক্ষু মেলে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কিছু কিছু বিজ্ঞানী যে একেবারেই বিস্ময় প্রকাশ করে না তা নয়। তবে লেখকের আক্ষেপের যথার্থতা তো রয়েছেই। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে মানবদেহকে একটা Microcosmos বা ক্ষুদ্রবিশ্ব হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এবং সেদিকে আল-কুরআনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। লেখকের সাথে আমার পূর্বপরিচিতি ছিল না। থাকলে বলতাম: যারা বিজ্ঞান পড়েন, তারা সাধারণত কুরআন পড়েন না। আর যারা কুরআন পড়েন তারা সাধারণত বিজ্ঞান পড়েন না। সমস্যাটা সেখানেই। অথচ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার জন্য কুরআনে অসাধারণ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ১০:১০১ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন: 'বলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি নজর দাও...।'

এখন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে (ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তম) সেগুলোর প্রতি নজর দেওয়াই তো বিজ্ঞানের আসল Agenda বা কর্মসূচি।

বিশ্বে যেসব জীব ও জড় পদার্থ আছে তাদের গঠনপ্রণালি, কার্যপদ্ধতি, তাদের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া এবং যেসব নিয়ম দ্বারা এই জড় ও জীবের শাসন পরিচালিত হয় সেগুলো জানানোই বিজ্ঞানের কাজ। মানবদেহ জীববিজ্ঞানের

একটি বিশেষ পাঠ্যসূচি। এ প্রসঙ্গে লেখক ভূমিকায় কুরআনের একটি আয়াত (আল্লাহর নিদর্শন) উল্লেখ করেছেন। তা হলো:

> 'সুনিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি চক্ষুষ্মান হবে না?'
> (আল-কুরআন ৫১:২০:২১)

পাঠকদের অবগতির জন্য উল্লেখ করছি আরও একটি আয়াত, যা উক্ত দু'টি আয়াতের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট।

> 'আমরা অচিরেই তাদের দেখাবো আমাদের নিদর্শনাবলি মহাবিশ্বে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। তখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন মহাসত্য। তোমার প্রভুর ব্যাপারে কি এ কথা যথেষ্ট নয় যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী?' (আল-কুরআন ৪১: ৫৩)

এই আয়াতগুলোতে 'মানবদেহ' ও 'বিশ্বজগত' এ দুটোকে Cosmos (বিশ্ব) হিসেবে গণ্য করার কথা আছে- একটা ছোট জগৎ আর একটা বড় জগৎ। এই দুই জগতের ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা যতই ব্যাপক হবে, বলাই বাহুল্য যে, মানবদেহকে ঠিকমতো পরিচালনা করার উপায় আরও ভালোভাবে উদ্‌ঘাটিত হবে।

এবারে আসি বইটির আলোচ্যসূচিতে। সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রক্তনালির কথা, হৃৎপিণ্ড নামক পাম্পমেশিনের কথা, হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধের উপায়, রোজা রাখার শারীরিক উপকারিতা, বর্তমান সময়ে স্বাস্থ্য ও সমাজের প্রতি দারুণ হুমকিস্বরূপ ধূমপান ও মাদকাসক্তির কথা। তাছাড়াও রয়েছে বিবাহের কথা, সংক্রামক রোগ ও মহামারির কথা। সবগুলো বিষয়ের ওপর সাবলীল আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় নৈতিকতার বিষয়টি একটি Central theme হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

তবে স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বলতে গেলে উপযোগী খাদ্যের রকম-সকম ও খাদ্যের পরিমাণের কথা এসে পড়ে। আজকাল Prophetic foods এবং Prophetic medicine নিয়েও লেখা হচ্ছে। নবীজি (স.) কী কী খাবার খেতেন এবং কোন কোন রোগে কী কী ওষুধের বিধান দিতেন, সেসম্পর্কে লোকজনের আগ্রহ বাড়ছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু লেখাও বেরিয়েছে। Herbal medicine

বা herbal food (অর্থাৎ খাদ্য ও ওষুধ বিষয়ে গাছগাছড়া ব্যবহারের উপযোগিতা) সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বাড়ছে। লেখক ভালো থাকার ক্ষেত্রে হাস্যকৌতুকের ভূমিকা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। কালোজিরা, আজোয়া খেজুর ইত্যাদির কথা বলেছেন। তবে আমি আশা করব, লেখক হারবাল খাবার ও হারবাল চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়গুলো বইটির পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করবেন। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রফেসর ড. এম শমশের আলী
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী।

লেখকের কথা

১৯৭৮ সালে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকে মানবদেহ নিয়ে পড়াশোনাই ছিল আমার জীবনের প্রধান কাজ। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে যতই জেনেছি, ততই বিস্মিত হয়েছি মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ দেখে। আমাদের শরীরের কোষ, মাইটোকন্ড্রিয়া, ডিএনএ, জিন, রক্তকণিকা, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, কিডনি ইত্যাদি যা-ই আলোচনা করি না কেন, প্রত্যেকটি জিনিস অত্যন্ত অলৌকিক। এগুলো অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে সীমাহীন নিপুণতার সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই কথাটি মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন:

> 'সুনিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে, তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি চক্ষুষ্মান হবে না?' (আল-কুরআন ৫১: ২০-২১)

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশে বা বিদেশের মেডিক্যাল কারিকুলামে মহান সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব এই নিদর্শনগুলোর কোনো আলোচনা নেই। অর্থাৎ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এখনও 'চক্ষুষ্মান' হতে পারেননি। মানবদেহ নিয়ে গবেষণা করে অনেকে এরকম ধারণায় উপনীত হন যে, অনেক কিছু জেনে গেছেন বা বুঝে গেছেন। অথচ মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞানের কাছে এ জ্ঞান খুবই নগণ্য।

> 'আর জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই তোমাদের দেওয়া হয়েছে।' (আল-কুরআন ১৭:৮৫)

সৃষ্টিকর্তার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের দূরত্ব তৈরি হওয়ার জন্য দায়ী হচ্ছে ইউরোপে চার্চের সাথে বিজ্ঞানের দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা নিজেদের আল্লাহর প্রতিনিধি বলে দাবি করত, মানুষকে পাপ মোচনের সার্টিফিকেট দিত এবং তাদের যেকোনো কথাকে অবনত মস্তকে জনসাধারণকে মেনে নিতে বাধ্য করত। যেসব বিজ্ঞানী তাদের সাথে একমত হতে পারেননি তাদের জন্য নিষ্ঠুরতম শারীরিক নির্যাতনের ব্যবস্থা করা হতো।[১] বাইবেলে সংযুক্ত গ্রিক ভূগোল ও অন্যান্য অবৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে মতভেদ করার কারণে অনেক বিজ্ঞানীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানী

মাইকেল সার্ভেটুস, দার্শনিক জোরদানোকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে।[২] বাইবেলের বর্ণনার বিরুদ্ধে 'পৃথিবী গোলাকার'– এই মতবাদ প্রচার করার কারণে পদার্থবিজ্ঞানী মাইকেল ব্রুনোকে একইভাবে হত্যা করা হয়। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে– এই রায় দেওয়ার কারণে গ্যালিলিওকে শেষজীবন জেলে অতিবাহিত করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়।

History of intellectual development of Europe বইয়ে John Willium Draper বলেন, 'Inquisiton Court'-এর মাধ্যমে ১৪৮১ সাল হতে ১৮০৮ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে তিন লাখ চল্লিশ হাজার জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে বত্রিশ হাজার জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে।'[৩]

ইসলামে এরকম সংঘর্ষের কোনো নজির নেই। কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বন্ধুর মতো। কুরআনের সূত্র ধরেই গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, অ্যালজেবরা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি বিকশিত হয়েছে এবং এক্সপেরিমেন্টাল সাইন্সের জন্ম হয়েছে, যা ছিল গ্রিক আমলের বিজ্ঞানচর্চায় অনুপস্থিত। [৪]

প্রখ্যাত অধ্যাপক Briffault এর ভাষায়:

> 'আমরা যাকে বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করে থাকি, তা জিজ্ঞাসু মন, নতুন অনুসন্ধান পদ্ধতি, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পদ্ধতি এবং গণিতশাস্ত্রের অগ্রগতির ফলেই ইউরোপে বিকাশ লাভ করে। সেই মন এবং পদ্ধতি ইউরোপকে সরবরাহ করেছিল আরবগণ'[৫]

মহান আল্লাহ বলেন:

> 'অবিশ্বাসীরা কি চিন্তা করে না যে, এসব আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, তারপর আমি তাদের আলাদা করলাম এবং পানি থেকে সৃষ্টি করলাম প্রত্যেকটি প্রাণীকে। আর আমি পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়ে দিয়েছি, যাতে সে তাদের নিয়ে হেলে না পড়ে। আর আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা এমন যে, এ নিদর্শনাবলির প্রতি দৃষ্টি দেয় না। আর আল্লাহই রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। সবাই এক একটি কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।' (আল-কুরআন ২১:৩০-৩৩)

এ আয়াতগুলোতে পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার অত্যাধুনিক তথ্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে, যা গবেষণা করে জানতে মানুষের কয়েক হাজার বছর সময় লেগেছে। অত্যাধুনিক টেলিস্কোপের মাধ্যমে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের মাত্র ২০ ভাগ সম্পর্কে সামান্য ধারণা পেয়েছেন। এতে বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহর সৃষ্টিক্ষমতা অপরিসীম। তাঁর এই সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করার জন্য কুরআন বার বার আহ্বান জানিয়েছে।

শুধু বিজ্ঞান নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও কুরআনের কাছে আধুনিক সভ্যতার ঋণ অনেক। প্রফেসর Briffault আরও বলেন:

'সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা, আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা, পরামর্শের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনা, বিশ্বজনীন ভোটাধিকার, সেই চেতনা– যা ফরাসি বিপ্লবকে অঙ্কুরিত করেছে, স্বাধিকারবোধের সেই ঘোষণা– যা মার্কিন সংবিধানকে একটি কাঠামো প্রদান করেছে, ল্যাটিন অ্যামেরিকার দেশসমূহের স্বাধীনতার আগুনকে প্রজ্বলিত করেছে, সেসব পশ্চিমা সভ্যতার কোনো দান নয়; বরং এ সকল চেতনা ও অভিব্যক্তি তারা শেষ পর্যন্ত কুরআন থেকেই পেয়েছে।[৬]

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কুরআনের অবদান একইভাবে প্রযোজ্য, যা আমার আলোচনায় তুলে ধরেছি।

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে আরবরা ছিল একটি বন্ধ্যা জাতি। তাদের দীর্ঘ ইতিহাসে কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জন্ম হয়নি। কুরআন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আরব ও অন্যান্য জাতির মধ্যে আল জাবির, আল বাত্তানি, ইবনে নাফিস, আল বেরুনি, আয জাহরাবি, ইবনে রুশদ, উমর খৈয়াম, আল রাজি, ইবনে সিনা, নাসিরুদ্দিন তুসি এরকম অনেক বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছে, যারা পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। কুরআনিক বিজ্ঞানের এই মশালটি মুসলিমরা প্রায় ৭০০ বছর ধরে বহন করেছে। ঐ সময় ইউরোপ ছিল অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত। ইউরোপের কোনো কোনো রাজা নিজেদের নাম পর্যন্ত স্বাক্ষর করতে পারতো না। ইউরোপের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরিতেও অল্পসংখ্যক বই পাওয়া যেতো। ঐ সময় মুসলিম-স্পেন জ্ঞানের আলো ছড়াতে থাকে। ইউরোপ থেকে শত শত শিক্ষার্থী স্পেনে আসত আরবি ভাষা শিখে জ্ঞান আহরণের জন্য।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মেজর আর্থার লিন বলেন: 'আরববাসীদের মাঝে সভ্যতা, মানসিক উৎকর্ষতা ও উচ্চশিক্ষার প্রণালি প্রবর্তিত না হলে ইউরোপ অদ্যাবধি অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকত। বিজেতার ওপর তারা যেমন উদারতা ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করেছিল তা সত্যিই চিত্তাকর্ষক।'

ইবনে সিনা ও আল রাজির লেখা বই ইউরোপে কয়েক শতাব্দী যাবৎ পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিমরা জ্ঞানের মশাল ইউরোপের কাছে হস্তান্তরের পর নিজেরাই এখন অন্ধকারে নিমজ্জিত। বর্তমান মুসলিমবিশ্ব কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে বিজ্ঞান থেকেও দূরে সরে গেছে এবং সেরকম মনীষী আজ তেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আধুনিক শিক্ষিতদের কুরআনের দিকে তথা 'চক্ষুষ্মান' বিজ্ঞানচর্চার দিকে উদ্বুদ্ধ করা।

সোভিয়েত রাশিয়াতে ডাক্তারি পড়ার সময় আমাদের পড়তে হয়েছিল যে, বস্তু অবিনশ্বর, এর সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও নেই। এর অর্থ হচ্ছে তাহলে সৃষ্টিকর্তাও নেই। ডারউইনিজমের মতো অবৈজ্ঞানিক থিওরিকে এই নাস্তিক্যতাবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাও আমাদের পড়তে হয়েছে। অথচ বিগব্যাং থিওরি (যা উপরে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে) প্রমাণ করেছে যে, এ পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ধ্বংসও হবে (Big Crunch)[৭]। কুরআনে এই কথাটি বার বার বলা হয়েছে। কাজেই অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী মহান সৃষ্টিকর্তাকে আর উপেক্ষা করার উপায় নেই বিজ্ঞানের। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যা আমার লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ বইয়ের আলোচ্যবিষয় যদিও স্বাস্থ্য সুরক্ষা, তারপরও আমি এতে মহান সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত অলৌকিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়েও কিছুটা আলোচনা করেছি। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও সৃষ্টিক্ষমতা সম্পর্কে পাঠকদের স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া।

> 'অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম কাঠামোয়।'
> (আল-কুরআন ৯৫:৪)।

সত্যি, আমাদের শরীরের কোষ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি অঙ্গ এক একটি অতি আশ্চর্যজনক জিনিস, যেগুলোর ওপর গবেষণা করার জন্য শত শত চিকিৎসাবিজ্ঞানী নিয়োজিত। প্রশ্ন হচ্ছে, অসীম জ্ঞানের অধিকারী মহান

আল্লাহ সর্বোত্তম কাঠামোর দেহটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ম্যানুয়েল বা নিয়মাবলি পাঠিয়েছেন কি? যদি পাঠিয়ে থাকেন তাহলে তা অলৌকিক একটি ম্যানুয়েলই হবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এই ম্যানুয়েলটি কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, যা আমি একত্র করার চেষ্টা করেছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত 'স্বাস্থ্যের' সংজ্ঞা অনুযায়ী এই ম্যানুয়েলটি আলোচনা করা হয়েছে। যে জাতি এই ম্যানুয়েলটি যত বেশি অনুসরণ করবে তারা তত বেশি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। যদিও ম্যানুয়েলটি ১৪০০ বছরের পুরোনো, তারপরও বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার এর সর্বজনীনতাই প্রমাণ করছে। আর এটি যে মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয় তাও আমার বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিশ্বায়নের যুগে অবাধ যৌনাচার, যৌনরোগ, পর্নোগ্রাফি, পারিবারিক কাঠামোর অধঃপতন, বিবাহবিচ্ছেদ, লিঙ্গ বৈষম্য, ভ্রূণ হত্যা বা গর্ভপাত, মাদকাসক্তি, খাদ্যে ভেজাল, আত্মহত্যা, অনিদ্রা, মানসিক রোগ, অন্যায় যুদ্ধবিগ্রহ ও শরণার্থীদের মানবেতর জীবন, পরমত অসহিষ্ণুতা এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর অমানবিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, বিনা বিচারে আটক এবং অস্বাস্থ্যকর জেলজীবন, অনিরাপদ সড়ক ও জলপথ ইত্যাদি স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং কম-বেশি অনেক জাতি এগুলোর শিকার। এ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এগুলোর সত্যিকার সমাধান হবে যদি আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার এ সংক্রান্ত অলৌকিক ম্যানুয়েলটি ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারি।

পরিশেষে, বইটি লেখা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে বাংলাদেশের বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এম শমশের আলী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী'র কাছে আমি ঋণী এ কারণে যে, তাঁরা এ বইয়ের মানোন্নয়নে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এম আবদুল আজিজকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রফেসর ডা. কর্নেল জেহাদ খান (অব.)
ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৪

মানবসৃষ্টির সূচনা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অনেক আয়াতে মানুষকে বিজ্ঞানচর্চার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর অপূর্ব সৃষ্টিকে আরও ভালোভাবে জানা। নিম্নের আয়াতগুলো এমনই ধরনের-

> 'মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্য থেকে বের হয়।' (আল-কুরআন ৮৬: ৫-৭)

এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমি বেশ কয়েকজন আলিমকে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা সঠিক জবাব দিতে পারেননি। না পারারই কথা, যেহেতু তারা চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেননি। কিন্তু কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসককে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলে তিনি সাথে সাথেই সঠিক জবাব দিয়ে দেন। কারণ তিনি পরীক্ষিত ও প্রমাণিত জ্ঞানের ভিত্তিতেই কথাটি বলে থাকেন। এখানে সবেগে স্খলিত পানি বলতে পুরুষের বীর্যকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তা মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্য থেকে কীভাবে বের হয়?

মহান আল্লাহ এখানে শালীন ভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই সুন্দর ভাষার আড়ালে চিকিৎসাবিজ্ঞান লুকিয়ে আছে, যা সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। ১৪০০ বছর আগে যখন এ আয়াতগুলো নাজিল হয় তখন মানুষের জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। এমনকি বিখ্যাত তাফসিরকারকরা অনেক গবেষণা করেও এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক তাফসিরকারকদের অভিমত নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

ইবনে আব্বাস (রা.) তার তাফসিরে এ আয়াতগুলোর ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, বেশি ব্যাখ্যা করেননি। তবে সবেগে স্খলিত পানি বলতে তিনি বীর্যকেই বুঝিয়েছেন। তাবারি, ফখরুদ্দীন রাজি, কুরতুবি, ইবনে কাছির (রহ.) বলেছেন যে, মেয়েদের বুক ও পুরুষের মেরুদণ্ড থেকে এ পানি নির্গত হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সব অঙ্গ থেকেই এটা বের হয়। তাদের মতে, 'বুক ও পিঠের মাঝখান থেকে' বলতে সমস্ত শরীরকে বোঝানো হয়েছে।

কারী মোহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) লিখেছেন যে, খাদ্যদ্রব্য হজম হওয়ার চতুর্থ স্তরে গিয়ে বীর্য সৃষ্টি হয়। তারপর তা দেহের প্রতিটি অঙ্গ হতে নিঃসৃত হয়। এরপর তা অণ্ডকোষের পাশে কুঞ্চিত শিরায় এসে জমা হয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তাকি উসমানী (রহ.) এ আয়াতগুলোর তেমন ব্যাখ্যা করেননি। মুফতি মোহাম্মদ শফি (রহ.) লিখেছেন যে, বীর্য প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয়। তবে বেশি প্রভাব থাকে মস্তিষ্কের। এজন্য যারা অতিরিক্ত স্ত্রীমৈথুন করে তারা প্রায়ই মস্তিষ্কের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। আর মস্তিষ্কের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে সেই শিরা, যা মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে পৃষ্ঠদেশ ও পরে অণ্ডকোষে পৌঁছে। এরই কিছু উপশিরা বক্ষের অস্থিপাঁজরে এসেছে।[৮]

উপরে বিখ্যাত তাফসিরকারকদের ব্যাখ্যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এরকম ব্যাখ্যা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরীক্ষিত ও প্রমাণিত তথ্যের সাথে বেশ অসঙ্গতিপূর্ণ। যে ব্যাখ্যাটি চিকিৎসকদের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হবে তা হচ্ছে তাফহিমুল কুরআনের ব্যাখ্যা। সেখানে বলা হয়েছে: 'ভ্রূণতত্ত্বের (Embryology) দৃষ্টিতে এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, ভ্রূণের (Foetus) মধ্যে যে অণ্ডকোষে বীর্যের জন্ম হয় তা মেরুদণ্ডে ও বক্ষপাঁজরের মধ্যস্থলে কিডনির নিকটে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে অণ্ডকোষ ধীরে ধীরে অণ্ডথলিতে (Scrotum) নেমে আসে। কিন্তু তার স্নায়ু ও শিরাগুলোর উৎস সবসময় সেখানেই (মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে) থাকে। পিঠের নিকটবর্তী মহাধমনি (Aorta) থেকে ধমনিগুলো (Artery) বের হয় এবং পেটের সমগ্র অঞ্চল অতিক্রম করে সেখানে রক্ত সরবরাহ করে। এভাবে দেখা যায়, অণ্ডকোষ আসলে পিঠের একটি অংশ। শরীরের অতিরিক্ত উষ্ণতা সহ্য করার ক্ষমতা না থাকার কারণে তাকে অণ্ডথলিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। উপরন্তু যদিও অণ্ডকোষ বীর্য উৎপাদন করে এবং তা মৌলিক কোষে (Seminal vesicles) জমা থাকে তবুও মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলই হচ্ছে তাকে বের করার কেন্দ্রীয় সঞ্চালন শক্তি। মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুবিক প্রবাহ এ কেন্দ্রে পৌঁছার পর কেন্দ্রের সঞ্চালনে (Trigger Action) মৌলিক কোষ সংকুচিত হয়। এর ফলে তরল শুক্র পিচকারীর ন্যায় প্রবল বেগে বের হয়। এজন্য কুরআনের বক্তব্য চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল।'[৯]